ইসলামি গণতন্ত্রের স্বরূপ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

ভূমিকা: গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের সামঞ্জস্য নিয়ে বিভিন্ন ধারণা বা বক্তব্য রয়েছে, যা অনেক মুসলিমের কাছে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। ইসলামি গণতন্ত্র বলতে যা বোঝানো হয়, তা কতটা সত্য এবং কতটা ধোঁকাবাজি হতে পারে, এ বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনার প্রয়োজন। এই প্রবন্ধে সে বিষয়েই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

গণতন্ত্রের পরিচয়: বাংলায় "গণতন্ত্র" পরিভাষা যেটি ইংরেজি ডেমোক্রেসি (Democracy) থেকে এসেছে। ডেমোক্রেসি (Democracy) শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ δημοκρατία (দেমোক্রাতিয়া) থেকে, যার অর্থ **"জনগণের শাসন"**।

শব্দ থেকেই স্পষ্ট এটা জনগণের শাসন, আল্লাহর শাসন না। আগ্রহী চিন্তাশীল পাঠক পাঠ্যপুস্তক/উইকিপিডিয়া (বা এই পিডিএফটি পড়তে পারেন https://archive.org/details/20250202_20250202_1806) থেকে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা সহ বিস্তারিত জেনে নিতে পারেন। তো গণতন্ত্রে জনগণের শাসন কীভাবে হয়?

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতা যেভাবে জনগণ থেকে উৎসরিত হয়: মূল ক্ষমতার মালিক জনগণ>সে সংবিধান প্রণয়ণ কমিটি বা সংসদকে (ভোট দেয়ার মাধ্যমে) অথোরিটি দেয় তার পক্ষ থেকে সংবিধান প্রণয়ণের> কমিটি সংবিধান প্রণয়ন করে>প্রণীত সংবিধান হয় জনগণের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ আইনের মূল উৎস>এরপর এই সংবিধানের ওপর ভিত্তি করে শাসন, আইন ও বিচার বিভাগ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

এভাবেই বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরাসরি জনগণ দেশ পরিচালনা না করলেও, তারা নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। এই প্রতিনিধিরা জাতীয় সংসদ বা অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে বসে জনগণের পক্ষে কাজ করেন। সংসদ সদস্যরা নতুন আইন প্রস্তাব করতে পারেন এবং বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও সংশোধন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন। জনগণই যেহেতু তাদেরকে প্রতিনিধি বানিয়েছে সেজন্য তারা যে আইন তৈরি, সংশোধন বা বাতিল করে সেটা জনগণের ইচ্ছারই বহিপ্রকাশ। যদি জনপ্রতিনিধি জনগণের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে ব্যার্থ হয় বা জনগণ যদি তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কার্যক্রমে অসন্তুষ্ট হয়, তাহলে তারা পরবর্তী নির্বাচনে সেই প্রতিনিধিকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে। এভাবেই জনগণ পরোক্ষভাবে দেশ শাসন করে। এজন্যই বলা হয় **"জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস"**।

'নির্বাচন' গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একটি মৌলিক ভিত্তি। কিন্তু গণতন্ত্র শুধু প্রতিনিধি নির্বাচনের নাম না। আপনার ভোটে নির্বাচিত হওয়া সংসদ সদস্যই সংসদে আইন প্রণয়ন করেন, আইন বাতিল ও সংশোধন করেন। অর্থাৎ সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত এই প্রতিনিধিরা শুধু এলাকার উন্নয়নের কাজই করে না। তাঁদের দায়িত্বগুলোর একটা হলো **আইন প্রণয়ন।**

প্রশ্ন হচ্ছে মানুষের জন্য আইন তৈরির এই ক্ষমতা কি মানুষ রাখে? মানুষ কি মানুষকে আইনদাতা বানাতে পারে? যদি বানায়, তাহলে কি উভয়েই মুমিন থাকে?

আল্লাহর গুণবাচক নাম সমূহের একটি হচ্ছে আল-হাকীম (الحكيم) বা আল-হা'কাম (الحكم) অর্থাৎ অটল বিচারক, মহা বিচারপতি, হুকুমদাতা, আইন-বিধান দাতা।

আল্লাহ কুরআনে বলেন,

اِنِ الۡحُکۡمُ اِلَّا لِلّٰہِ

আল্লাহ ছাড়া কোন বিধান দাতা নেই। [12:40]

আল্লাহ আরো বলেন,

اَلَا لَـهُ الۡخَـلۡقُ وَالۡاَمۡرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الۡعٰلَمِيۡنَ

জেনে রেখ, সৃষ্টি তাঁর, হুকুমও (চলবে) তাঁর, বরকতময় আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতিপালক। [7:54]

কুরআনে এ সংক্রান্ত আরো অনেক আয়াত আছে। উপরুক্ত আয়াত দ্বয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ-ই একমাত্র হুকুম দাতা, বিধান দাতা। আর গণতন্ত্র এমন এক সিস্টেম যে সিস্টেম মানুষকে মানুষের বিধান দাতা বানাতে বাধ্য করে। সেই বিধানদাতা হতে পারে জুব্বা, টুপি পড়া অথবা অন্য কোনো পোষাকের। সেই বিধানদাতা হতে পারে হুজুর অথবা মুজুর। কীভাবে?

সংসদে যখন রাষ্ট্রীয় নিয়ম মেনে নতুন আইন/বিল পাসের প্রস্তাব উঠানো হয় তখন সদস্যদের **ইখতিয়ার** দেয়া হয় এই আইন পাস হবে কি-না? যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য তৃতীয়/শেষ পাঠেও বিলটির পক্ষে ভোট দেন ('হ্যাঁ' জয়যুক্ত হয়), তবে বিলটি সংসদে পাস হয়। এবং বিল পাস পরবর্তী নিয়মকানুন মেনে সেটি রাষ্ট্রীয় আইন হয়। যা লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আর 'না' জয়যুক্ত হলে অর্থাৎ বিপক্ষে ভোট দিলে বিলটি বাতিল হয়। এই সিস্টেমে সময়ে সময়ে আইন পরিবর্তন এবং বাতিলও হয়। কিন্তু এই যে সদস্যদেরকে **ইখতিয়ার** দেয়া হয় কোনো আইন গ্রহণ বা বর্জণের -এটাই হচ্ছে সেই কুফর যেটাকে ক্ষমতায় গিয়ে ইসলামি আইন পাস কারীরাও কোনো কৌশলেই এড়াতে পারেন না। যার ফলে ইসলামি আইন পাস কারীরাও নিজেদেরকে আইনদাতা হিসেবে

প্রমাণ করে/করতে বাধ্য। এখানে আরও লক্ষণীয় সংসদে ইসলামি আইন এই কারণে পাস হয় না যে এটা আল্লাহর আইন। বরং এই কারণে পাস হয় যে, এই আইনকে সংসদ সদস্যরা **অনুমতি দিয়েছে।** অর্থাৎ আল্লাহর আইন মানা হবে কি-না সেজন্য মানুষের কাছে অনুমতির জন্য উপস্থাপন করা হচ্ছে। যদি সদস্যরা অনুমতি দেয় তবে আল্লাহর আইন চলবে নচেৎ চলবে না। নাউজুবিল্লাহ!

তাও সব বিধানের জন্য না। চুরির আইনের জন্য একবার, মদ নিষিদ্ধ জন্য একবার, আরেকবার জিনার আইনের জন্য...। আর এভাবেই ইসলামি কোনো আইন পাস হলেও সেটা জনগণের শাসন-ই হয়। আল্লাহর শাসন নয়। আল্লাহর আইন তো সংসদে পাসের জন্য উত্থাপনের-ই প্রয়োজন নেই মুসলিম শাসকদের জন্য। কারণ তারা যখনই শাহাদাহ পাঠ করে মুমিন হয়েছে তখন থেকেই তার উপর আল্লাহর আইনই চূড়ান্ত। অর্থাৎ আমার/আমাদের ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায় আল্লাহর বিধান মানতে, আর সক্ষমতা হলে আল্লাহর বিধান মানাতে প্রয়োজনে বাধ্য করতেও আমরা বাধ্য। ভিন্ন কিছু বেছে নেয়ার অপশন নেই। আল্লাহ কুরআনে বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ের ফায়সালা দিলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর জন্য সে ব্যাপারে তাদের নিজেদের কোনো রকম (ভিন্ন সিদ্ধান্তের) ইখতিয়ার থাকবে না। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল, সে নিঃসন্দেহে সুস্পষ্টভাবে গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) হলো। [33:36]

সুতরাং হে প্রিয় মুসলিম ভাই আমার! ইসলামি গণতন্ত্রের ধোঁকা থেকে নিজের ঈমান বাঁচান।

পারস্য সাম্রাজ্যের শাসক রুস্তমের সামনে ইসলামের উদ্দেশ্য তুলে ধরতে সাহাবী রিবঈ ইবনে আমের রাযি. বলেছিলেন, **"আল্লাহ আমাদেরকে পাঠিয়েছেন, <u>যেন আমরা মানুষকে বান্দার গোলামী/বন্দেগী থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর গোলামী/বন্দেগীতে নিয়ে আসি</u>, পৃথিবীর সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে আখিরাতের প্রশস্ততার দিকে নিয়ে যাই, এবং অন্যান্য জীবন ব্যবস্থা/ধর্মের অবিচার থেকে মুক্ত করে ইসলামের ন্যায়ের দিকে নিয়ে আসি।"**

আন্ডারলাইন করা কথাটা আবারও পড়ুন। বার বার পড়ুন। আল্লাহর আইন আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠার কাজ করতে হবে ঠিকই। কিন্তু নিজেকে বান্দার/মাখলুকের বন্দেগীতে লিপ্ত করে কেনো? আগে নিজেকে একনিষ্ঠ ভাবে এক আল্লাহর গোলাম বানাই। ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠা না হলেও আমার ঈমান থাকলে জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাতে যেতে পারবো কিন্তু যদি ঈমানটাই ধ্বংস করে দেই তাহলে তো আমি নিজেই ইসলাম হারালাম, প্রতিষ্ঠা করবো কীভাবে?

আর যারা শুধুমাত্র গণতন্ত্র চর্চা করছে আগে পিছে নামে মাত্রও 'ইসলাম' নেই তাঁদের নিয়ে আলাদা করে কিছু বলার প্রয়োজন আছে কি?

গণতন্ত্র যখন ইসলাম প্রতিষ্ঠার কৌশল: ক্ষমতায় গিয়ে মানুষকে ইসলামের সৌন্দর্য দেখালেই যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যেতো তাহলে তো যখন ইসলাম অর্ধ জাহানে তার সৌন্দর্য প্রকাশ করেছিলো তখন মুসলিমদের আর সামরিক শক্তির প্রয়োজনই ছিলো না। এমনিতেই ইসলাম আরও প্রসারিত হতো।

খিলাফতে রাশেদার সময়ের চাইতেও কি আমরা আরও ভালোভাবে ইসলামের সৌন্দর্য প্রদর্শন করতে সক্ষম? তখন কি ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রু ছিলো না? তাঁদেরকে দমানোর জন্য, ইসলাম ও মুসলিমদের নিরাপত্তার জন্য তখন কি সামরিক শক্তি প্রয়োগের দরকার হয়নি? তাহলে আজ আমরা কীভাবে এটা মনে করছি যে, ক্ষমতায় গিয়ে ইসলামের ইনসাফ, সৌন্দর্য দেখিয়ে ইসলামের আইন বাস্তবায়ন করবো আর ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুরা বসে থাকবে? তাঁদের থেকে নিজ সরকারের ক্ষমতা রক্ষার জন্যেও তো সামরিক শক্তির বিকল্প আমাদের কাছে নেই। মুসলিমরা যেখানে মিসওয়াকের মতো একটা সুন্নত আমলের অনুপস্থিতির কারণে শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারে না সেখানে আমরা **কুফরের পথে হেঁটে** শরীয়াহ'র আইন বাস্তবায়ন করে ফেলবো? কৌশল হিসেবেও এটা নিছক আত্মপ্রবঞ্চনা, মুসলিমদেরকে ধোঁকা দেয়া, মুসলিমদের সময় আর মেধার অপচয় ছাড়া আর কি? ইসলাম এতোটা মিসকিন হয়ে গেলো যে দ্বীন প্রতিষ্ঠার নিয়ম পদ্ধতি কাফিরদের থেকে ধার করতে হবে? এখন তো কেউ কেউ আবার শরীয়াহ'র আইনের কথাও আর বলছে না। বরং কল্যাণ রাষ্ট্রের বয়ান করছে। তাহলে এতোদিন কীসের সবক শোনানো হলো মুসলিমদের? বিষয়গুলো নিয়ে সৎ ভাবে ভাবা উচিৎ আমাদের।

ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে হক চেনার ও মানার তাওফিক্ব দান করুন আর প্রত্যেক ভূখণ্ডে ইসলাম ও মুসলিমদেরকে কাফের, মুশরিক ও জালেমদের উপর সাহায্য করুন। আমীন ইয়া রব।

বিঃদ্রঃ এই লেখায় কোনো ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে তাকফির (কাফের বলা) করা হয়নি বা পাঠকও কাউকে তাকফিরের অধিকার রাখেন না। কেউ কুফরে লিপ্ত আছে বলা আর কাফের বলা আলাদা বিষয়। পাঠক যেনো নিজে কুফর ও ভুল পথ চিনে নিজেকে তা থেকে বাঁচাতে পারেন সেটাই উদ্দেশ্য। তাকফিরের বিষয়টা বিজ্ঞ উলামাদের কাজ। সুতরাং কাউকে কুফরে লিপ্ত দেখলেও কাফের বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা কাম্য।